কওমীর পাঠ্যবই

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ইতিহাসের বদলে পাকিস্তানপ্রীতি স্পষ্ট আছে বলে বলছেন মাদ্রাসার নিয়ে কাজ করেন এমন বিশেষজ্ঞ আলেম ওলামারাও। একই সঙ্গে সাধারণ ও মাদ্রাসা বোর্ডের পাঠ্যপুস্তকের শুরুতে জাতীয় পতাকার ছবি ও জাতীয় সঙ্গীত থাকলেও 'বেফাকের' কওমীতে এসব রাখা হয় না। জাতির বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে হাইকোর্টের রায়ও আছে। তাও মানছে না বেফাক। তাদের পাঠ্যপুস্তকে ঠিকই লেখা 'জিয়াউর রহমানই ঘোষক'। বেফাক পরিচালিত কওমী মাদ্রাসার পাঠ্য বইয়ের সাম্প্রতিক অবস্থা ঘেঁটে এমন বিকৃতি ইতিহাসের চিত্রই পাওয়া গেছে। কওমী মাদ্রাসা ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, দেশে কওমী মাদ্রাসার সংখ্যা দেশে আসলে কত তার হিসাব নেই কারও কাছেই। তবে ধারণা করা হয় এ সংখ্যা ৪০ থেকে ৫০ হাজার হবে। সরকারিভাবে অবশ্য গবেষণা ছাড়াই বিভিন্ন সময় তথ্য দিয়ে বলা হয়েছে, এ সংখ্যা হবে ১৪ হাজারের মতো। বেসরকারী বিভিন্ন হিসাবে কওমী মাদ্রাসায় অর্ধ কোটি শিক্ষার্থী আছে। এই মাদ্রাসার নেই কোন সরকারী স্বীকৃতি ও নিয়ন্ত্রণ, পাঠ্যসূচীও অনুমোদিত নয়। দেশের কওমী মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রণ করে ১৯ জাতীয় ও আঞ্চলিক বোর্ড। তবে, কওমী মাদ্রাসাগুলোর সবচেয়ে বড় নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড (বেফাক)। এই বোর্ডের নিয়ন্ত্রণ যাদের হাতে তাদের অধিকাংশই এখন হেফাজতের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। এই নেতারাই আবার বিএনপি-জামায়াত জোটের শরিক দলের নেতা। ফলে এরা এখন কওমী মাদ্রাসাকে ব্যবহার করছেন অপরাজনীতির কাজে। সম্প্রতি নিজেদের রাজনৈতিক চেহারা লুকাতে বেফাকের নেতারা কৌশলে বইয়ের ওপরে লেখকের নাম বাদ দিয়ে ভেতরটা আগের মতোই রেখে দেয়ার কৌশল নেয়। ইতোমধ্যেই সে কাজটা তারা করেও ফেলেছে। তবে ফাঁস হয়ে গেছে তাদের প্রতারণার চেহারা। কৌশলে পাঠ্যবই 'সংস্কার' করা হলেও ভুলে ভরা এসব বইয়ে নেই আধুনিকতার ছোঁয়া এবং প্রযুক্তি নিয়ে কোন তথ্য। বরং বিভিন্ন স্তরের বইয়ে সরকার ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের ক্ষেপিয়ে তুলতে উস্কানি দেয়া তথ্য রয়েছে। বলা হয়েছে, রাষ্ট্রের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দিতে সরকার ব্যর্থ। ইতিহাস বইয়ে বাংলাদেশ, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস থাকলেও তা মিথ্যা। এমনকি স্বাধীনতা দিবসের কোন তথ্য নেই। সরকারী স্বীকৃতি ও নিয়ন্ত্রণ, পাঠ্যসূচীও অনুমোদিত না হওয়ায় কওমীতে পড়া শিক্ষার্থীরা পাঠ করছে ভুল তথ্য, বিকৃত ইতিহাস।

কথিত সংস্কার, ইতিহাস বিবৃতির ভয়ংকর চেহারা ॥ কথিত সংস্কারের পর বই ঘেঁটে দেখা গেছে, এসব বই রচনা এবং সম্পাদনা যারা করেছেন তাদের নাম নেই কোন বইতেই। সেখানে 'বেফাক নিয়োজিত সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত' লেখা রয়েছে। যদিও ভেতরের সবই রয়েছে আগের মতোই। কওমী মাদ্রাসার পাঠ্যবই ঘেঁটে দেখা গেছে, কওমী মাদ্রাসা বোর্ডের 'সাহিত্য সওগাত' (১ম, ২য়, ৩য় ভাগ) ছাড়া বিভিন্ন শ্রেণীর বইতে লেখকের গদ্য, প্রবন্ধ থাকলেও কোন বইতে নেই লেখক পরিচিতি।

ফলে শিক্ষার্থীরা লেখক সম্পর্কে কোন তথ্য জানতে পারছেন না। পঞ্চম শ্রেণীর ইতিহাস বইয়ে ৬১ পৃষ্ঠায় রয়েছে 'স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম' প্রবন্ধ। যদিও প্রথম প্রকাশের সময় প্রবন্ধ ছিল না। ২০১৪ সালে প্রকাশ কালে এই 'স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম' প্রবন্ধ যুক্ত করা হয়েছে। তবে এই প্রবন্ধে ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস উল্লেখ থাকলেও নেই 'স্বাধীনতা এবং, দ্বাদশতম, বৃহত্তম ও শ্রেষ্ঠ শিরোনামে লেখায় শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে রয়েছে আব্দুল আলিম, শ্রেষ্ঠ কারী মাওলানা ইবরাহীম উজানী, শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী জয়নুল আবেদিন, শ্রেষ্ঠ খতীব মুফতি আমীমুল ইহসান, শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস মাওলানা সাঈদ আহমদ সন্দীপের নাম রয়েছে। তবে কিসের ভিত্তিতে এই শ্রেষ্ঠত্ব তা উল্লেখ নেই। পঞ্চম শ্রেণীর 'ভূগোল ও সমাজ পরিচিতি বইয়ে ৪৭ থেকে ৫২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত 'বাংলাদেশের জনসংখ্যা: সমস্যা ও সম্ভাবনা' প্রবন্ধে জনসংখ্যা, সমস্যা হিসেবে উল্লেখ নেই। বরং সরকারকে দোষারোপ করা হয়েছে নানাভাবে। সরকারের অব্যবস্থাপনার জন্য মানুষ খাদ্য, শিক্ষা, বাসস্থান থেকে বঞ্চিত হয়েছে বলেই উল্লেখ করা হয়েছে এই প্রবন্ধে।

বিকৃতির এখানেই শেষ নয়। সাধারণ ও মাদ্রাসা বোর্ডের পাঠ্যপুস্তকের শুরুতে জাতীয় পতাকার ছবি ও জাতীয় সঙ্গীত থাকলেও কওমীতে তা অনুসরণের বালাই নেই। বেফাক নেতারা আবার নিজেদের পক্ষে সাফাই গেয়ে বলছেন, সাধারণ শিক্ষার ধারায় এখনও ব্রিটিশদের ছাপ রয়ে গেছে, অন্তত তা থেকে তারা ব্যতিক্রম। অবশ্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের মাদ্রাসার বইয়ের সঙ্গে কওমী মাদ্রাসার বইগুলোর কোন তুলনা চলে না বলে বলছেন বিশেষজ্ঞরা। এনসিটিবির প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীর বাংলা বই ঘেঁটে দেখা যায়, এগুলো শুরু হয়েছে জাতীয় পতাকার ছবির সঙ্গে এর বিস্তারিত বিবরণ ও জাতীয় সঙ্গীত দিয়ে। যা পাওয়া যায়নি কওমীর কোন বইয়েই। বরং একই স্থানে দেয়া হয়েছে কওমী মাদ্রাসা বোর্ডের মহাসচিব মুহাম্মাদ আব্দুল জব্বার জাহানবাদীর বক্তব্য। এ মহাসচিব হেফাজতের রাজনীতির সঙ্গেও যুক্ত। দলটির অন্যতম নেতাও।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে স্বীকৃতি দিতে রাজি নয় বেফাক। তাদের পাঠ্যপুস্তকে তাই জিয়াউর রহমানই ঘোষক। কথিত সংস্কারের পরেও একই অবস্থা রাখা হয়েছে। এতে প্রকৃত ইতিহাস থেকে দূরে থাকছেন কওমীর শিক্ষার্থীরা। জানছেন ভুল, শিখছেন ভিন্ন ও বিকৃত ইতিহাস। বেফাক বলছে, জেনেশুনেই তাদের পাঠ্যপুস্তকে ঘোষক হিসেবে জিয়াউর রহমানের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ঘোষক মানতে তাদের আপত্তি রয়েছে। পঞ্চম শ্রেণীর ইতিহাস বইয়ে 'স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম' প্রবন্ধে বলা হয়েছে, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের মধ্যরাতে ইতিহাসের বৃহত্তম গণহত্যা শুরু হয়। শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে 'পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। দেশবাসী দিশেহারা হয়ে পড়ে। এমনি এক সময়ে ২৭ মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তার ঘোষণা শুনে বাংলার জনগণ অনুপ্রাণিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রবন্ধে জিয়াকে স্বাধীনতার 'ঘোষক' বলা হলেও শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির জনক বা বঙ্গবন্ধু হিসেবেও উল্লেখ করা হয়নি। এমনকি মুক্তিযুদ্ধে কতজন শহীদ হয়েছেন সে বিষয়েও কোন তথ্য দেয়া হয়নি।

মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস ও আদালতের রায় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে কওমী মাদ্রাসা বোর্ডের মহাসচিব মুহাম্মাদ আব্দুল জব্বার জাহানবাদী বলেন, 'আইন করে' বঙ্গবন্ধুকে স্বাধীনতার ঘোষক বলাটা 'জুয়াচুরি'। সরকার আইন করে শেখ মুজিবকে স্বাধীনতার ঘোষক বলাটা ভুয়া আইন, জুয়াচুরি- এটা হয় না। জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষক- আমিও এটার পক্ষে। জেনেশুনেই তাকে স্বাধীনতার ঘোষক বলা হয়েছে। স্বাধীনতার ঘোষক তো শেখ মুজিব না মন্তব্য করে তিনি বলেন, তিনি তো পাকিস্তানের জেলখানায় ছিলেন। ঘোষণা তো জিয়াই দিয়েছেন। উনি (বঙ্গবন্ধু) তো জেলখানায়, কোথায় ঘোষণা দিয়েছেন?

নিজেদের পাঠ্যপুস্তকে শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু ও জাতির পিতা হিসেবে উল্লেখ না করলেও বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে তার 'অনেক অবদান' রয়েছে বলে মন্তব্য করেন জব্বার।

কাদের লেখা বই পড়ানো হয় কওমীতে? স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার বিরোধিতাকারী হিসেবে অভিযুক্ত লেখক-সাহিত্যিকরাই কওমী মাদ্রাসার পাঠ্যপুস্তক প্রণেতা ও লেখক হিসেবে রয়েছেন। লেখকদের মোহাম্মদ, আশকার ইবনে শাইখ ও ড. আশরাফ সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতার অভিযোগ রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্রের প্রণীত 'একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়' গবেষণাগ্রন্থে এ সব অভিযোগের তথ্য রয়েছে। গ্রন্থটিকে মুক্তিযুদ্ধের ওপর শক্তিশালী গবেষণা বলে অভিহিত করা হয়। বলা হয় এটিই সবচেয়ে বড় দলিল। স্বাধীনতাবিরোধীদের কাছে যে ক'জন বুদ্ধিজীবী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তাদের মধ্যে অন্যতম অধ্যাপক আখতার ফারুক। তিনি সর্বশেষ বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের নায়েবে-আমিরের দায়িত্ব পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি জামায়াতে ইসলামীর মজলিসে শূরার সদস্য ছিলেন। 'একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়' গ্রন্থের ৮০ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, আখতার ফারুক স্বাধীনতার সময় ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর মজলিসে শূরার সদস্য এবং দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকার সম্পাদক। পৃষ্ঠার শুরুতে বলা হয়েছে, 'আখতার ফারুক কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। আখতার ফারুক মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে মোহাম্মদ উল্লা হাফেজ্জী হুজুর প্রতিষ্ঠিত খেলাফত আন্দোলনে যোগ দেন। এরপর বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসে ছিলেন। 'একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়' গ্রন্থে উল্লেখ আছে, ১৭ মে ৭১ তারিখে সংবাদপত্রে ৫৫ বুদ্ধিজীবী একটি বিবৃতি দেন। এই বিবৃতিতে বলা আছে, আওয়ামী লীগের চরমপন্থীরা এই সরল-সহজ আইনসঙ্গত দাবিকে একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণার দাবিতে রূপান্তরিত করায় আমরা মর্মাহত হয়েছি। আমরা কখনও এটা চাইনি, ফলে যা ঘটেছে তাতে আমরা হতাশ ও দুঃখিত হয়েছি।

তৎকালীন দৈনিক পাকিস্তানে প্রকাশিত বিবৃতিতে ৫৫ বুদ্ধিজীবী, কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীর নাম ছিল। এর মধ্যে ১৮ নম্বর তালিকায় নাম ছিল ড. আশরাফ সিদ্দিকীর। ওই সময় তিনি বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা প্রতিষ্ঠানটির দায়িত্বে ছিলেন বলে ওই গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। 'অভিযুক্ত' ড. আশরাফ সিদ্দিকীর পদ্য 'নিমন্ত্রণ' জায়গা পেয়েছে 'সাহিত্য সওগাত'-এ, ৮ম শ্রেণী (৩য় ভাগ) পৃষ্ঠা ১২১-এ।

৫৫ বুদ্ধিজীবীর স্বাধীনতাবিরোধী বিবৃতিতে ১১ নম্বর তালিকায় ছিলেন আশকার ইবনে শাইখ। যিনি ওই সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের সিনিয়র লেকচারার ছিলেন। যার মূল নাম মোঃ ওবায়দুল্লাহ। যাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দালালির অভিযোগে পরবর্তী সময়ে বাধ্যতামূলক ছুটি দেয়া হয়েছিল। তিনি বিটিভি ও বেতারেও কাজ করেছেন। বেফাক বোর্ডের 'সাহিত্য সওগাত', ৮ম শ্রেণী (৩য় ভাগ) ৫২ পৃষ্ঠায় তার রচিত 'মুক্তি অভিনব' শীর্ষক গদ্যটি স্থান পেয়েছে।

৫৫ বিবৃতিদাতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন ড. কাজী দ্বীন মোহাম্মদ। 'একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়' গ্রন্থে তার সম্পর্কে বলা আছে, তিনি বিবৃতিতে নামের পাশে সই ছাড়া নামপত্রের ওপর সই করেছেন। স্বাধীনতার পর তাকেও দালালির অভিযোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠায়। ৩-১০-১৯৭৩ সালের দৈনিক বাংলার প্রতিবেদন অনুযায়ী তাকে ১ অক্টোবর ৭৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চাকরি থেকে বরখাস্ত করে। ড. কাজী দ্বীন মোহাম্মদ রচিত লেখা 'ইনসাফ' গদ্য 'আদর্শ বাংলা পাঠ', (৩য় শ্রেণী), 'সভ্য ও অসভ্য'; 'আদর্শ বাংলা পাঠ', (৫ম শ্রেণী), 'বাঙলা সাহিত্যের গোড়ার কথা', 'সাহিত্য সওগাত', ৬ষ্ঠ শ্রেণী (১ম ভাগ), 'মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্য', 'সাহিত্য সওগাত', ৭ম শ্রেণীতে (২য় ভাগ) পাঠ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত।

জানা গেছে, কওমী মাদ্রাসা সনদের সরকারী স্বীকৃতির লক্ষ্যে ২০১২ সালে সরকার 'বাংলাদেশ কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা কমিশন' গঠন করে। এতে দারুল উলুম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্রাসার মহাপরিচালক ও হেফাজতের আমির আহমদ শফীকে চেয়ারম্যান এবং গহরডাঙ্গা মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মুফতি রুহুল আমিনকে সদস্য সচিব করা হয়। ওই কমিটি একটি নেসাব ও নেজামে তালিম প্রণয়ন সাব-কমিটিও গঠন করে। ওই কমিটিতে আহ্বায়ক হিসেবে ছিলেন মুফতি রুহুল আমিন। সদস্য ছিলেন আরও ৬ জন। এর মধ্যে প্রথম সদস্য ছিলেন ঐতিহাসিক শোলাকিয়া ঈদগাহের খতিব মাওলানা ফরিদ সিলেবাস প্রত্যাখ্যান করে। সিলেবাস প্রণয়ন কমিটির সদস্য মাওলানা ফরিদ উদ্দিন মাসউদ বলেন, আমরা শুরু করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু কিছু তো হলো না। বলা হলো, সনদ স্বীকৃতি বাস্তবায়িত হলে লাখ লাখ লাশ পড়বে। তারপর সব বন্ধ। এখনও ওই অবস্থাতেই রয়েছে। কিছু করার নেই আমাদের। কথা হলো নেসাব ও নেজামে তালিম প্রণয়ন সাব-কমিটির আহ্বায়ক মুফতি রুহুল আমিনের সঙ্গে। তিনি বলেন, 'কোন মন্তব্য নেই। কিছু করতে পারলাম না। কী বলার আছে।'